দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 AUG 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

027

শিক্ষাঙ্গন

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষি শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশে কেবলমাত্র একটি। রাজধানী ঢাকা থেকে ৭৬ মাইল দূরে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে ১৯৬১ সালে পরতিষ্ঠিত হয় দেশের একমাত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়— বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মসিংহ।

আমাদের মত কৃষিপ্রধান দেশে এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি তথা কৃষির সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে কৃষি শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না।

ইংরেজ শাসনামলে আমাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কৃষি শিক্ষার বলতে গেলে ন্যূনতম ব্যবস্থাও ছিল না। যদিও সমসাময়িককালে ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষা পদ্ধতির সর্বস্তরে কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার স্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে করে কৃষি বিজ্ঞানের এক বিরাট কাঠামো গড়ে ওঠেছিল সেসব দেশে। এদিক থেকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভূমিকা ছিল মৌলিক ও তাত্তিক বিষয়বস্তুর অধ্যাপনায় সীমাবদ্ধ। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৪০ সাল নাগাদ এ অঞ্চলের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের পাঠ্যবস্তু ছিল শুধু তিনটি বিষয়— পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান ও গণিত। পরবর্তীকালে এই অনুষদে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ তৎকালীন কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ধারণা দিয়েছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পুর নিয়ম চর্চার স্থান। এখানে মৃত্তিকা, ফসল, পোকা-মাকড় ইত্যাদি নিম্নস্তরের পাঠসূচী অপাংক্তেয়। এই মানসিকতার ফসল আমরা এখনও ভোগ করছি হাড়ে হাড়ে। বিভাগোত্তর উপমহাদেশে (পাকিস্তান ও ভারত উভয় দেশেই) কতিপয় চিন্তাশীল কৃষি বিজ্ঞানী দেশের উন্নয়নের স্বার্থে এই মানসিকতার উর্ধ্বে ওঠে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় কৃষি বিজ্ঞানকে প্রতিষ্টা করার প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিই তৎকালীন পশুচিকিৎসক ও পশুপালন কলেজটিকে কেন্দ্র করে ১৯৬১ সালে আজকের এই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদান ও গবেষণার মাধ্যমে কৃষি এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে জ্ঞানের উন্নতি সাধন এবং সেই উন্নত জ্ঞানকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার মহৎ সংকল্প নিয়ে এই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যাতে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও চেতনার আত্মোপলব্ধির আলোকে এবং বাস্তবতার নিরীখে বিকাশ লাভ করে। এ ব্যাপারে শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তক তাকে সহায়তা করবে মাত্র। আর এই কারণে শিক্ষা ব্যবস্থা অনুকূল ধারায় প্রবাহিত হওয়া একান্ত কর্তব্য। কৃষি শিক্ষা বিকাশ তথা দেশের অর্থনীতি সুসংহত করার লক্ষ্যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিচালিত হওয়া উচিত। এ জন্যে অবশ্যই আমাদের আধুনিক কৃষি শিক্ষা ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে। বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে কোন কিছুই থামিয়ে রাখা উচিত হবে না। যেহেতু কৃষি বিজ্ঞান একটি প্রায়গিক বিজ্ঞান, সেজন্য অন্যান্য বিজ্ঞান শিক্ষার সাথে এর শিক্ষাক্রম পরিচালিত হওয়া উচিত। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সবার্থের উর্ধ্বে ওঠে কৃষি শিক্ষা বিকাশের ক্ষেত্রে নতুন নতুন চিন্তাধারা সংযোজন করা প্রয়োজন।

৬০ দশকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির নিয়ম যা ছিল ৭০ এর দশকে এসে তা প্রয়োজনীয় কারণেই পরিবর্তন হয়। প্রথমে এখানে মাধ্যমিক পাস ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করার নিয়ম ছিল। পরে তা পরিবর্তন করে উচ্চ মাধ্যমিক (বিজ্ঞান/কৃষি) পাস ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করা হয়। বর্তমান পর্যন্ত এ নিয়ম অব্যাহত থাকলেও ভর্তি হওয়া এখন চরমপ্রতিযোগিতার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'৭০ সালে পুরাতন সিলেবাস সামান্য কিছু পরিবর্তন করা হয়। স্বাধীনতার পর সিলেবাসের সামান্যতম পরিবর্তন করা হয়নি। অথচ এ পরিবর্তন অব্যাহত থাকার কথা যেহেতু বিজ্ঞান দিন দিন উন্নত হচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু নিয়ম-কানুন আদিকাল থেকে চলে আসছে। যা কিনা কৃষি শিক্ষার বিকাশকে পিছনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

অটোমেশন ঃ অটোমেশন হচ্ছে এমন একটি নিয়ম যা প্রথম বর্ষে পর পর দু'বার এবং অন্যান্য বর্ষে তিনবার অকৃতকার্য হয় তবে সেই শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশুনার কোর্স শেষ না করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করতে হয়। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে আর পড়াশুনা করতে দেয়া হয় না। এ ধরনের নিয়ম সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক। এ ধরনের নিয়ম-কানুন দেশে কিংবা বিদেশেব কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। কেবলমাত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের নিয়ম চালু করে কৃষি শিক্ষার মানকে ছোট করে দেখা হয়েছে। কারণ এ ধরনের নিয়ম দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু পাস করানোর জন্যে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে।

আর এতে করে ছাত্র-ছাত্রীদের শুধ পাস করে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে ফলে কৃষি শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাহত। সুতরাং পাস করানো নিয়ম পরিহার করে কৃষি শিক্ষার মানন্নোয়নের কলা কানুন তৈরী করা দরকার। তাতে দেশ ও জাতি সর্বাধিক উপকৃত হতো। তাছাড়া আর একটি প্রসঙ্গ এসে যায় তা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই কিংবা তিনটি বর্ষ অতিক্রম করতে ৪ থেকে ৬ বছর লেগে যায়। সেখানে একজন শিক্ষার্থী ৪/৫ বছর অধ্যয়ন করার পর অটোমেশনের কারণে উচ্চ শিক্ষা থেকে চিরকালের জন্যে বঞ্চিত হচ্ছে। বিশেষ করে বর্তমানকালে যে চরম প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে ভর্তি হতে হয় সে বিচারের মানদণ্ডে তুলনামূলকভাবে বেশ ভাল ছাত্র কিংবা ছাত্রীর ভাগ্যে যদি কোন অটোমেশন জুটে যায় তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে একটা ভালো সম্ভাবনাময় জীবন চিরকালের জন্যে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হলো। অনেকে এর স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেন, এ ধরনের নিয়মের কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা করবে। কথাটি যদি সত্য হয় অর্থাৎ অটোমেশনকে ভয় পেয়ে যদি কেউ পড়াশুনা করে থাকে তাহলে বলতে হয় সেই সব ছাত্র-ছাত্রী জ্ঞান আহরণের জন্যে নয় পাস করার জন্যে পড়াশুনা করে। এ ধরনের নিয়মের কারণে প্রতি বছর ২/৪ জন যে অটোমেশন পাচ্ছে না— এমনতো নয়।

তাহলে এ প্রথা দ্বারা কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে পাস করানো যাচ্ছে কিন্তু কোন ক্রমেই 'ফেল' রোধ করা যাচ্ছে না। তাহলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে উন্নততর পদ্ধতির দ্বারাই উন্নত শিক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

এ প্রথা যে কত ভয়ংকর তা ছোট একটি উদাহরণ টেনে বলা যেতে পারে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী অটোমেশন পেয়েছে এবং ভবিষ্যতে ২/৪ জন যে পাবে না এমন কথা বলা যায় না। ইতিপূর্বে অটোমেশন পেয়ে ২/৪ জন ছাত্র মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে চিরকালের জন্যে পাগলের খাতায় নাম লিখিয়েছে। অনেকেই আত্মহননের চেষ্টাও করেছে। সুতরাং যে ব্যবস্থা শিক্ষার মানন্নোয়ন তো নয় বরং ছাত্রদেরকে পাগল করে কিংবা আত্মহননের চিন্তা মাথায় যোগায় তা আর যাই হোক না কেন শিক্ষার কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। এমন ব্যবস্থা বাতিল করে শিক্ষার মানন্নোয়নের উপায় উদ্ভাবন করা দরকার। —রণজিত